Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা বনাম ইসলামী সভ্যতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লুসাত হুমায়রা

রোলঃ 227020955

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা বনাম ইসলামী সভ্যতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লুসাত হুমায়রা

রোলঃ 227020955

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পশ্চিমা সভ্যতা বনাম ইসলামী সভ্যতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লুসাত হুমায়রা, আইডিঃ 227020955 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পশ্চিমা সভ্যতা বনাম ইসলামী সভ্যতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

লুসাত হুমায়রা

আইডিঃ 227020955

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: সভ্যতা

১.১ সভ্যতা কী?

ইংরেজি Civilization এর বাংলা অর্থ সভ্যতা। Civilization অর্থ হলো- আদিম বা অজ্ঞ অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থায় তুলে আনা,সভ্য করা, উন্নত ও শিক্ষিত করা। সভ্যতা একটি সংগঠিত মানবসমাজের জটিল রূপ, যা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গঠিত। এটি মানুষের জীবনযাত্রার সেই স্তরকে নির্দেশ করে যেখানে সংগঠিত সমাজ গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান, নীতি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিকাশ ঘটে। সভ্যতা মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাস থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে, এবং এটি একটি সমাজের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনযাত্রার প্রতিফলন। এডওয়ার্ড গিবন তাঁর গ্রন্থ "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire"-এ বলেছেন:

"সভ্যতা হলো মানুষের নৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতি, যেখানে মানুষ তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।" [১]

গিবন সভ্যতার স্থায়িত্বের জন্য নৈতিকতার গুরুত্বকে জোর দিয়েছেন। আবার, অ্যারনল্ড জে. টয়েনবি সভ্যতাকে একটি প্রাণবন্ত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, "সভ্যতা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সমাজ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে সৃষ্টিশীল প্রতিক্রিয়া জানায় এবং এই প্রতিক্রিয়া সঠিক হলে সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।"

টয়েনবির দৃষ্টিতে, সভ্যতার বিকাশ চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। সংক্ষেপে, সভ্যতা হলো মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতির সমন্বিত অগ্রগতি, যা একটি সমাজের পরিচয় ও বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে।

১.২ সভ্যতার লড়াই

সভ্যতার লড়াই বলতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক পার্থক্য থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বকে বোঝায়। একটি সভ্যতা সাংস্কৃতিক দিক থেকে এগিয়ে থাকলে অপর একটি সভ্যতা যখন ভিন্ন সাংস্কৃতিক দর্শন নিয়ে আসে তখন মূলত সংঘর্ষ বাধে। এটি একটি ধারণা যা মূলত স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের তত্ত্ব থেকে জনপ্রিয় হয়েছে। হান্টিংটনের মতে, আধুনিক বিশ্বে দেশ বা আদর্শভিত্তিক লড়াইয়ের পরিবর্তে সভ্যতাগুলোর মধ্যে সংঘাত হবে।

"দুই সভ্যতার লড়াই" মূলত একটি ধারণা যা পৃথিবীর দুটি সভ্যতার

সংঘাত বা প্রতিযোগিতাকে বোঝায়। এটি সাধারণত সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে সংঘাতকে নির্দেশ করে। এ ধরনের লড়াই মানব ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক, যা সভ্যতার বিকাশে প্রভাব ফেলে এসেছে।

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দন্দ" বইতে ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে বিরোধের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবিক স্বাধীনতা এবং ভোগবাদিতাকে গুরুত্ব দেয়, যেখানে ইসলাম মানবতার কল্যাণ, আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছে, যা দুই সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদভী রহ. ইসলামী সভ্যতার শান্তিপূর্ণ দর্শন এবং এর আদর্শের গুরুত্ব তুলে ধরেন। [২]

সভ্যতার দ্বন্দ্বের প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের পার্থক্য
প্রতিটি সভ্যতার নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, এবং নৈতিক মূল্যবোধ থাকে, যা অন্য সভ্যতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।উদাহরণ: পশ্চিমা সমাজের উদারনৈতিক মূল্যবোধ বনাম প্রথাগত ইসলামিক সভ্যতায় রক্ষণশীলতা।

২. ধর্মীয় মতাদর্শের সংঘাত

ধর্ম মানুষের জীবনযাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস ও অনুশীলনের পার্থক্য সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

উদাহরণ: ক্রুসেড যুদ্ধ (খ্রিস্টান বনাম ইসলাম), হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘাত।

৩. অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সম্পদ দখল

আর্থিক প্রভাব বিস্তারের জন্য সভ্যতাগুলো একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

উদাহরণ: মধ্যপ্রাচ্যে তেলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর আগ্রহ।

৪. রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই

এক সভ্যতা অন্য সভ্যতার ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ: শীতল যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা দেশ ও চীনের ক্ষমতার প্রতিযোগিতা।

৫. প্রযুক্তি ও আধুনিকায়নের প্রভাব

প্রযুক্তি উন্নতির মাধ্যমে এক সভ্যতা অন্য সভ্যতার ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলে সেই আধুনিকায়ন দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেয়।

উদাহরণ: সামরিক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিযোগিতা।

৬. পরিচয়ের সংকট ও আত্মরক্ষার প্রবণতা

যখন একটি সভ্যতা অন্য সভ্যতার শক্তিশালী প্রভাবের মুখে পড়ে, তখন তাদের নিজস্ব পরিচয় ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

উদাহরণ: উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির প্রতিরোধ।

৭. ঐতিহাসিক বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা

ঐতিহাসিক শত্রুতা বা দখলের স্মৃতি দুই সভ্যতার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বৈরিতা সৃষ্টি করতে পারে।

উদাহরণ: ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাত।

এই কারণগুলো সভ্যতার সংঘাতকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

১.৩ পশ্চিমা সভ্যতার পরিচয়

পশ্চিমা সভ্যতা বলতে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাভিত্তিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ও সমাজব্যবস্থার সম্মিলিত রূপকে বোঝানো হয়। এটি প্রধানত গ্রিক, রোমান, এবং খ্রিস্টান ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত এবং পরবর্তীতে রেনেসাঁ, প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার, এবং আলোকিত যুগের প্রভাবের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার মূল উপাদানগুলো হলো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি গুরুত্বারোপ।

পশ্চিমা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য:

১. সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি
প্রাচীন গ্রিস এবং রোমান সভ্যতার গণতান্ত্রিক ও আইনের ধারণা।
খ্রিস্টধর্ম থেকে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা।
রেনেসাঁ ও আলোকিত যুগের মাধ্যমে যুক্তি ও বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব।

২. রাজনৈতিক আদর্শ
গণতন্ত্র, মানবাধিকার, এবং আইনের শাসনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা ও সমাজে ব্যক্তির অধিকারের সুরক্ষা।

৩. অর্থনৈতিক কাঠামো
মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মুক্তবাজারের গুরুত্ব বেশি।
শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে উৎপাদনশীলতা ও বৈশ্বিক বাণিজ্যে অগ্রগামী।

৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
আলোকিত যুগের পর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দারুণ অগ্রগতি, যা শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক বিশ্বের গঠনকে প্রভাবিত করেছে।
উদ্ভাবন ও অনুসন্ধানে উদারতা এবং সমর্থন।

৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতি
শিক্ষার মাধ্যমে যুক্তি, মানবতাবাদ, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ।

শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার।

৬. ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা

খ্রিস্টধর্ম পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্রীয় অংশ হলেও, আধুনিক পশ্চিমা সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. সামাজিক কাঠামো ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার, এবং সাম্যাবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা।নারী স্বাধীনতা, লিঙ্গ সমতা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় জোর।

পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব:

এটি আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক রূপকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘাত এবং সহযোগিতার মাধ্যমে বৈশ্বিক সমাজে একটি প্রভাবশালী অবস্থান তৈরি করেছে।

১.৪ ইসলামী সভ্যতার পরিচয়

ইসলামী সভ্যতা বলতে এমন একটি জীবনব্যবস্থা বোঝায়, যা ইসলাম ধর্মের মূলনীতি, মূল্যবোধ, এবং শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এটি এমন একটি সমাজ ও সংস্কৃতি যা কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়, সাম্য, শান্তি ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

ইসলামী সভ্যতা কেবল ধর্মীয় আচার-আচরণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা। ন্যায়বিচার, জ্ঞানার্জন এবং নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার ওপর ভিত্তি করে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ নির্মাণে সহায়তা করে।

মূল উপাদান:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য।
২. শরিয়াহর বিধি-বিধান মেনে চলা।
৩. জ্ঞান, বিজ্ঞান ও গবেষণার প্রতি গুরুত্ব।
৪. মানবতার কল্যাণ ও নৈতিকতার বিকাশ।
৫. ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা।

অধ্যায় ২: ঐতিহাসিক বিকাশ

২.১ পশ্চিমা সভ্যতার উৎপত্তি

পশ্চিমা সভ্যতার উৎপত্তি মূলত প্রাচীন গ্রিস এবং রোমান সভ্যতা থেকে হয়। এই সভ্যতাগুলোই আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

প্রাচীন গ্রিসের ভূমিকা:

প্রাচীন গ্রিসে (খ্রিস্টপূর্ব ৮ম-৪র্থ শতাব্দী) দর্শন, গণতন্ত্র, নাটক, এবং বিজ্ঞান ব্যাপক উন্নতি লাভ করে।সক্রেটিস, প্লেটো, এবং অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকরা জ্ঞান এবং যুক্তির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।গ্রিসেই প্রথম গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ধারণা গড়ে ওঠে, যা আজকের আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

রোমান সভ্যতার অবদান:

রোমান সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২৭ - খ্রিস্টাব্দ ৪৭৬) আইন, প্রশাসন, এবং অবকাঠামোর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করে।রোমান আইনের ধারা এবং বিচার ব্যবস্থা আজও অনেক আধুনিক রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোতে প্রভাব ফেলছে।

"প্যাক্স রোমানা" বা রোমান শান্তি একটি স্থিতিশীল এবং সুসংগঠিত সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেয়।

খ্রিস্টধর্মের উদ্ভব এবং বিস্তার:

খ্রিস্টধর্মের জন্ম প্রথম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ঘটে এবং তা দ্রুত পশ্চিমা সভ্যতার প্রধান ধর্মে পরিণত হয়।মধ্যযুগে (৫ম-১৫শ শতাব্দী) খ্রিস্টধর্ম পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

রেনেসাঁ এবং আধুনিক যুগ:

১৪শ থেকে ১৭শ শতাব্দীতে ইউরোপে রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে শিল্প, বিজ্ঞান, এবং জ্ঞানচর্চায় নবজাগরণ ঘটে।এই সময়েই পশ্চিমা সভ্যতার আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানবতাবাদী চিন্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সারসংক্ষেপে, পশ্চিমা সভ্যতার সূচনা মূলত প্রাচীন গ্রিস ও রোম থেকে হলেও, খ্রিস্টধর্ম, রেনেসাঁ, এবং পরবর্তী যুগের শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমে তা একটি সমৃদ্ধ রূপ নেয়।

২.২ পশ্চিমা সভ্যতার মাইলফলক

পশ্চিমা সভ্যতার বিকাশে বিভিন্ন সময়কাল জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক রয়েছে, যা সভ্যতার মূল কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন - "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" বই এ বলেছেন,
"The West has been built on the foundations of Christianity, classical Greek philosophy, and Roman law. These intellectual traditions have shaped Western civilization and its identity, and they remain its core even as the West becomes more secular and more diverse." [৩]
"পশ্চিমা সভ্যতা খ্রিস্টান ধর্ম, প্রাচীন গ্রীক দর্শন এবং রোমান আইনের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। এই বৌদ্ধিক ঐতিহ্যগুলো পশ্চিমা সভ্যতা এবং এর পরিচিতি গঠন করেছে, এবং যদিও পশ্চিম আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠছে, তবুও এই ভিত্তিগুলো এর মূল।"

এছাড়াও, বার্নার্ড লুইস - "The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror" বই এ বলেছেন,
"The Western world is the product of the dual heritage of Greece and Rome, coupled with the Christian faith, which defined the boundaries of thought, action, and authority." [৪]
(পশ্চিমা বিশ্ব গ্রীস এবং রোমের দ্বৈত ঐতিহ্য এবং খ্রিস্টান ধর্মের মিশ্রণের ফলস্বরূপ, যা চিন্তা, কর্মকাণ্ড এবং কর্তৃত্বের সীমানা নির্ধারণ করেছে।)

এখানে পশ্চিমা সভ্যতার প্রধান মাইলফলকগুলো তুলে ধরা হলো:

১. প্রাচীন গ্রিস (খ্রিস্টপূর্ব ৮ম-৪র্থ শতাব্দী) গণতন্ত্রের উদ্ভব: এথেন্সে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
দর্শনের বিকাশ: সক্রেটিস, প্লেটো, এবং অ্যারিস্টটল জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রাখেন।
ওলিম্পিক গেমস: ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বে শুরু হয়, যা সংস্কৃতি ও ঐক্যের প্রতীক।
সাংস্কৃতিক উন্নয়ন: নাটক, স্থাপত্য (পার্থেনন), এবং গণিতের বিকাশ।

২. রোমান সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২৭ - খ্রিস্টাব্দ ৪৭৬)আইনব্যবস্থা: "রোমান আইন" আধুনিক আইনের ভিত্তি স্থাপন করে।
প্যাক্স রোমানা: দুই শতাব্দীর দীর্ঘ শান্তি, যা উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে সহায়তা করে।
ইনফ্রাস্ট্রাকচার: রোমান রাস্তা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা (একুয়েডাক্ট), এবং শহর পরিকল্পনা।
খ্রিস্টধর্মের বিস্তার: খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রথম রোমান সাম্রাজ্যে স্বীকৃতি পায় এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।

৩. মধ্যযুগ (৫ম-১৫শ শতাব্দী) খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রীয় ভূমিকা: চার্চ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্র।
সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা: কৃষি ও জমির মালিকানাভিত্তিক অর্থনীতি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা: প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো (১২শ শতাব্দী) শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখে।
ক্রুসেড: ধর্মীয় যুদ্ধ, যা ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটায়।

৪. রেনেসাঁ (১৪শ-১৭শ শতাব্দী) মানবতাবাদী আন্দোলন: মানুষকে কেন্দ্র করে শিল্প, সাহিত্য, ও বিজ্ঞানচর্চার পুনর্জাগরণ।
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং মাইকেলেঞ্জেলো: শিল্পে অভূতপূর্ব অবদান।
মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার: জোহানেস গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র (১৪৪০) জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে।

৫ বিজ্ঞানবিপ্লব (১৬শ-১৮শ শতাব্দী) গ্যালিলিও, কপারনিকাস, এবং নিউটন: মহাবিশ্ব এবং পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তকারী আবিষ্কার।
মুহাম্মদ আসাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতির মূল কারণ হিসেবে ত্রৈমাসিক ধারার (থিওলজি, দর্শন এবং বিজ্ঞান) সমন্বয়ে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে অগ্রণী শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"পশ্চিমা সভ্যতা গড়ে উঠেছে গ্রীক দর্শন, রোমান আইনের ধারাবাহিকতার এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবের মাধ্যমে। তবে, এর সত্যিকারের অগ্রগতি এসেছে বিজ্ঞানের যুগ এবং বিজ্ঞানী, যেমন গ্যালিলিও, নিউটন ও কপর্নিকাসের চিন্তার ফলে, যা পাশ্চাত্য সমাজকে নানাভাবে পরিবর্তিত করেছে।" [৫]

৭. আলোকায়ন যুগ (১৭শ-১৮শ শতাব্দী)

যুক্তি এবং মুক্তচিন্তা: দার্শনিকেরা যেমন ভলতেয়ার, রুসো, এবং জন লক যুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থার ধারণা দেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি: ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের ধারণার বিকাশ।

৮. শিল্পবিপ্লব (১৮শ-১৯শ শতাব্দী)

এসময় শিল্পোৎপাদনে মেশিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন হয়। শহরের দ্রুত বিকাশ এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে।

৯. উন্নত আধুনিক যুগ (২০শ শতাব্দী)

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পশ্চিমা সভ্যতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে যায়। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৪৫) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রচেষ্টায়। এছাড়াও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেমন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, এবং মহাকাশ গবেষণার সূচনা ঘটে।

পশ্চিমা সভ্যতার মাইলফলকগুলো প্রাচীন গ্রিস ও রোমান সভ্যতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং মধ্যযুগ, রেনেসাঁ, বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে আজকের আধুনিক সভ্যতায় রূপ নিয়েছে। প্রতিটি মাইলফলক নতুন জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছে।

২.৩ পশ্চিমা সভ্যতার আধুনিক প্রভাব

পশ্চিমা সভ্যতা গত কয়েক শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে। রেনেসাঁ, এনলাইটেনমেন্ট এবং শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দিককে পরিবর্তন করেছে। নিচে এর আধুনিক প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

২.৩.১ রাজনৈতিক প্রভাব

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার:
পাশ্চাত্য সভ্যতা আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা প্রচলিত করেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত আদর্শগুলো পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি।

রাষ্ট্র ও সেক্যুলারিজম:
পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম এবং রাজনীতির পৃথকীকরণে ভূমিকা রেখেছে।

উপনিবেশবাদের উত্তরাধিকার:
উপনিবেশবাদী শক্তি হিসেবে পাশ্চাত্যের দেশগুলো অনেক দেশ ও সমাজে তাদের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো আরোপ করেছে। এ প্রভাব এখনো অনেক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিদ্যমান।

২.৩.২ সাংস্কৃতিক প্রভাব

ভোগবাদ ও জনপ্রিয় সংস্কৃতি:
পাশ্চাত্যের ভোগবাদ এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতি, যেমন হলিউড চলচ্চিত্র, ফ্যাশন, এবং সংগীত বিশ্বজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

ইংরেজি ভাষার বিস্তার:
পশ্চিমা সভ্যতার আধুনিক প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইংরেজি ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যা বৈশ্বিক যোগাযোগ এবং প্রযুক্তির প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার আধুনিকায়ন: পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা (বিশ্ববিদ্যালয় মডেল) এবং গবেষণার পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী গৃহীত হয়েছে।

২.৩.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব

পুঁজিবাদ ও বৈশ্বিক অর্থনীতি:
পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেল বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশ্বায়ন এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি পাশ্চাত্যের মডেল অনুসরণ করেছে।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন:
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতি আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করেছে। শিল্পবিপ্লব এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব বিশ্বজুড়ে উৎপাদন এবং বাণিজ্যের কাঠামো বদলে দিয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ:
আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক নীতির প্রতিফলন।

২.৩.৪ সামাজিক প্রভাব

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারীবাদ:
পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা এবং নারীর অধিকারের জন্য লড়াই অনেক দেশে সামাজিক পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন:
পাশ্চাত্যের প্রভাব বিশ্বজুড়ে পরিবার এবং লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। একক পরিবার, সমলিঙ্গ বিবাহ, এবং যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি এই প্রভাবের উদাহরণ।

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা:

পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের সীমিত ভূমিকা আধুনিক সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ঘটিয়েছে।

২.৩.৫ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থেকে আধুনিক প্রভাব

রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো:
উপনিবেশবাদী শক্তি হিসেবে পাশ্চাত্যের দেশগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো আরোপ করেছে, যা আজও বিদ্যমান।

সংস্কৃতির আধিপত্য:
অনেক জাতির স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিমা সভ্যতার আধুনিক প্রভাব বিশ্বব্যাপী ব্যাপক এবং গভীর। এটি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এবং মানবাধিকারের প্রচারে অবদান রাখলেও, অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমা সভ্যতার এই প্রভাব ব্যাখ্যা করে যে, আধুনিক বিশ্ব অনেকাংশে তাদের দ্বারা গঠিত এবং প্রভাবিত।

অধ্যায় ৩: ইসলামী সভ্যতার ঐতিহাসিক বিকাশ

৩.১ ইসলামী সভ্যতার উৎপত্তি

আরবে প্রাথমিক সূচনা:
ইসলামী সভ্যতা ৭ম শতাব্দীতে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে আরব সমাজে অশিক্ষা, গোষ্ঠীগত সংঘাত, এবং নৈতিক অবক্ষয়ের আধিক্য ছিল।

কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তি:
ইসলামী সভ্যতা আল্লাহর বাণী (কুরআন) এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাচরণ (সুন্নাহ) দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করে।

মদিনা সনদ:
মদিনা সনদ (Constitution of Medina) একটি ঐতিহাসিক দলিল যা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল। এটি মুসলিম, ইহুদি, এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার একটি চুক্তি, যা সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক দলিল ছিল না, বরং এটি ইসলামী শাসনব্যবস্থা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া ছিল, যা ইসলামের প্রসারে সহায়ক হয়েছে।

৩.২ ইসলামী সভ্যতার প্রধান মাইলফলক

৩.২.১ রাশিদুন খিলাফত (৬৩২-৬৬১)

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর চার খলিফার যুগে ইসলামী রাষ্ট্র দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য জয়, ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়।

৩.২.২ উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ

উমাইয়া যুগ (৬৬১-৭৫০):ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে; আরবি রাষ্ট্রভাষা হয়।

আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮):ইসলামী স্বর্ণযুগের সূচনা হয়।বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, সাহিত্য, এবং দর্শনে ইসলামি পণ্ডিতদের অবদান বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে।বাগদাদ হয়ে ওঠে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র।

৩.২.৩ আন্দালুস ও তুর্কি উসমানীয় সাম্রাজ্য

আন্দালুস (৭১১-১৪৯২):স্পেনে ইসলামী সভ্যতা বিজ্ঞান, শিল্পকলা, এবং জ্ঞানচর্চার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।কর্ডোবা বিশ্বের অন্যতম শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

উসমানীয় সাম্রাজ্য (১২৯৯-১৯২৪):উসমানীয় শাসন দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রতীক ছিল।কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম ইউরোপের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

৩.২.৪ সেলজুক ও মুঘল সাম্রাজ্য

সেলজুক সাম্রাজ্য:ইসলামী সভ্যতার সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে ভূমিকা রাখে।

মুঘল সাম্রাজ্য:ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতার বিস্তার এবং স্থাপত্যকলার চরম উৎকর্ষতা (তাজমহল, দিল্লির লালকেল্লা)।

৩.৩ ইসলামী সভ্যতার আধুনিক প্রভাব

৩.৩.১ আধুনিক সমাজে ইসলামের আদর্শিক প্রভাব

ইসলামের নীতিমালা আধুনিক সমাজে ন্যায়বিচার, দানশীলতা, এবং মানবিক সহমর্মিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে।মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইন (শরীয়াহ) আধুনিক আইন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৩.৩.২ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় অবদান

ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য আধুনিক শিক্ষার অনেক বিষয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছে। বিজ্ঞান, গণিত, এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিম পণ্ডিতদের অবদান ইউরোপীয় রেনেসাঁকে প্রভাবিত করেছে।

৩.৩.৩ আধুনিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা আধুনিক রাজনৈতিক কাঠামোয় প্রভাব ফেলেছে।সুদমুক্ত অর্থনীতি, জাকাত ব্যবস্থা, এবং সুষম সম্পদ বণ্টনের নীতিগুলো এখনও আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক।

৩.৩.৪ মুসলিম বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ভূমিকা

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট সত্ত্বেও ইসলামী সভ্যতা তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।ইসলামী সংগঠন এবং সংস্থা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইসলামী সভ্যতার বিকাশ একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, এবং রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে মানবজীবনে গভীর ছাপ ফেলেছে। ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে ইসলামী সভ্যতা বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আধুনিক সমাজেও এর প্রভাব অপরিসীম।

অধ্যায় ৪: শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামো

সভ্যতার গঠন ও বিকাশে শাসনব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শাসনব্যবস্থা একটি সমাজের নৈতিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন।

৪.১ পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন

পশ্চিমা সভ্যতার রাজনৈতিক চিন্তা বিভিন্ন যুগ ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে আধুনিক গণতন্ত্র পর্যন্ত পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে অনেক দার্শনিক, সামাজিক বিপ্লব, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভাব ফেলেছে।

১. প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগ:
পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তি প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় স্থাপিত হয়।

গ্রীক রাজনৈতিক দর্শন:
গ্রীক দার্শনিকরা (প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস) শাসনব্যবস্থার মূল নীতিমালা ও কাঠামো নিয়ে চিন্তা করেন।

গণতন্ত্রের জন্ম: এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা হয়। জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত।

শাসনব্যবস্থার শ্রেণীকরণ: অ্যারিস্টটল শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রে শ্রেণীকরণ করেন।

রোমান শাসনব্যবস্থা:
রোমান সাম্রাজ্য শাসনব্যবস্থায় আইন ও সংগঠনের প্রতি জোর দেয়।

আইনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: রোমান আইন (জাস্টিনিয়ান কোড) পরবর্তীকালে পশ্চিমা আইনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে।

প্রজাতন্ত্রের ধারণা: রোমানরা প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে, যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করত।

২. মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় শাসনব্যবস্থা:
মধ্যযুগে পশ্চিমা রাজনৈতিক কাঠামো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত হয়।
চার্চের প্রভাব:চার্চ এবং শাসক শ্রেণীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল।ধর্ম ছিল শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। শাসকদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হত।"ডিভাইন রাইট অফ কিংস" তত্ত্ব অনুযায়ী, রাজাদের শাসনের অধিকার ঈশ্বরপ্রদত্ত।

সমাজব্যবস্থা:সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Feudalism) গড়ে ওঠে, যেখানে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব সমাজে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখত।

৩. রেনেসাঁ ও পুনর্জাগরণের যুগ:
১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর রেনেসাঁ ও পুনর্জাগরণের যুগে পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসে।
মানবতাবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা:গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ধর্মীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে।মানুষকে ধর্মের পাশাপাশি যুক্তি, বিচার এবং মানবতাবাদের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা শেখানো হয়।

ম্যাকিয়াভেলি ও রাজনীতির বাস্তববাদ:নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি তার বই The Prince-এ শাসকদের জন্য বাস্তববাদী রাজনৈতিক দর্শনের নীতি প্রদান করেন। শাসনের জন্য নৈতিকতার চেয়ে কার্যকারিতার উপর জোর দেন।

৪. আধুনিক যুগের রাজনৈতিক চিন্তা:
১৬শ থেকে ১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা:জন লক, টমাস হবস, জঁ জ্যাক রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমাজ চুক্তি এবং রাষ্ট্রের ন্যায্যতা বিষয়ক ধারণা বিকশিত হয়।রুশোর The Social Contract রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে চুক্তির ধারণা প্রদান করে।

গণতন্ত্র ও বিপ্লব:
আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬): এটি স্বাধীনতা এবং সংবিধান ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯): সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার স্লোগানে ফরাসি বিপ্লব গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে।

৫. আধুনিক গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকতা:
১৯শ এবং ২০শ শতাব্দীতে গণতন্ত্র এবং উদারনৈতিকতা পশ্চিমা সভ্যতার প্রধান রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা:জনগণের শাসন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে জোর দেওয়া হয়।শাসনব্যবস্থা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে গড়ে ওঠে।

উদারনৈতিকতা ও মানবাধিকার:ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার এবং সমতার ভিত্তিতে আইন গড়ে ওঠে।জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ পশ্চিমা আইনি কাঠামোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

পশ্চিমা সভ্যতার রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগের দর্শন থেকে শুরু করে মধ্যযুগের ধর্মীয় শাসন, রেনেসাঁর মুক্তচিন্তা এবং আধুনিক যুগের গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকতার মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী কাঠামো হিসেবে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তা মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, এবং গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

৪.২ ইসলামী সভ্যতার শাসনব্যবস্থা

ইসলামী সভ্যতার শাসনব্যবস্থা একটি অনন্য কাঠামো, যা পবিত্র কুরআন, হাদিস, এবং শরীয়াহর নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ইসলামী

শাসনব্যবস্থা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে শাসকের দায়িত্ব হলো আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। এটি ধর্মীয় নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায্যতার এক সমন্বিত কাঠামো। ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিবর্তন বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেছে, যা এখনো বিশ্ব ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করে।

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শাসনব্যবস্থা:

ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূল রূপ প্রবর্তিত হয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়। মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র শাসন ও নৈতিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

মদিনা সনদ:
এটি ছিল ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান।
মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি কাঠামো গড়ে তোলে। শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ন্যায়বিচার এবং সকল সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ন্যায়বিচারের মডেল: রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। শাসন ও আইন প্রয়োগে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ ছিল না।

২. খেলাফতব্যবস্থা:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী সভ্যতার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় খেলাফতব্যবস্থার মাধ্যমে। এটি ইসলামী শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

রাশেদীন খেলাফত (৬৩২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ):
চার খলিফা (আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রা.) ইসলামের মূল নীতিমালা অনুসরণ করে শাসন পরিচালনা করেন।এই সময়কালকে ইসলামী শাসনব্যবস্থার সোনালি যুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, এবং জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফত:
উমাইয়া খিলাফত শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে ইসলামের ভৌগোলিক বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আব্বাসীয় খেলাফতের সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যদিও এই দুই খিলাফত সময়ে শাসনে কিছুটা রাজতন্ত্রের প্রবণতা দেখা যায়, তবুও শরীয়াহর অনুসরণ অব্যাহত ছিল।

উসমানীয় খেলাফত (১৩০০-১৯২৪):

উসমানীয়রা খেলাফতব্যবস্থার সর্বশেষ রূপ ধারণ করে। এই সময় ইসলামী শাসনব্যবস্থা আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে একীভূত হয়। ধর্মীয় নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনের সমন্বয় এই খেলাফতের বৈশিষ্ট্য।

৩. ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূল নীতিমালা:

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব: ইসলামের শাসনব্যবস্থা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শাসককে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ এবং আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করতে হয়।

শূরা (পরামর্শ):
ইসলামী শাসনে শূরার গুরুত্ব অপরিসীম। জনগণের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি গণতন্ত্রের একটি প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচিত।

ন্যায়বিচার:

শাসনব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বৈষম্যের সুযোগ নেই।

জনগণের কল্যাণ:
ইসলামী শাসনব্যবস্থা জনগণের মৌলিক অধিকার যেমন খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়।

৪. আইনের উৎস:

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় আইন চারটি উৎসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে:
১. কুরআন: ইসলামী আইন বা শরীয়াহর প্রধান উৎস।
২. হাদিস: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও কর্ম।
৩. ইজমা: ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞদের মতৈক্য।
৪. কিয়াস: শরীয়াহর নীতির ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান।

৫. ইসলামী শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য:

ইসলামী শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো: ঈমানের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করা।
মানবজাতির নৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা।
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় প্রতিরোধ করা।
সামাজিক সম্প্রীতি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বের ভারসাম্য রক্ষা করা।

৪.৩ আইনি ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পশ্চিমা এবং ইসলামী সভ্যতার আইনি ব্যবস্থা তাদের সাংস্কৃতিক, দার্শনিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন। এই দুই সভ্যতার আইনি কাঠামোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, যা তাদের শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামোকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এই অংশে আইনের উৎস, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগের দিক থেকে তাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. আইনের উৎস

পশ্চিমা সভ্যতা:
সেক্যুলার ভিত্তি: পশ্চিমা আইনি ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ। এর ভিত্তি হলো মানুষের তৈরি আইন, যা জনগণের ইচ্ছা এবং সংসদীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণীত।
আইনের উদ্ভব: রোমান আইন (Roman Law), ম্যাগনা কার্টা, এবং আধুনিক সংবিধানগুলো পশ্চিমা আইনের ভিত্তি তৈরি করেছে।
সমাজের পরিবর্তনশীলতা: পশ্চিমা আইন সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য। এটি মানবাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

ইসলামী সভ্যতা:
ধর্মীয় ভিত্তি: ইসলামী আইন বা শরীয়াহ কুরআন, হাদিস, ইজমা (সম্মিলিত মত) এবং কিয়াস (যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত) থেকে উদ্ভূত।
অপরিবর্তনীয় মূলনীতি: শরীয়াহর মৌলিক নীতিমালা অপরিবর্তনীয়, তবে প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে কিছু স্থানে ইজতিহাদ (স্বতন্ত্র বিচার) প্রয়োগ করা হয়।
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি: ইসলামী আইন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মানব জীবনের সকল দিক পরিচালনার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো।

২. আইনের উদ্দেশ্য

পশ্চিমা আইন:
ব্যক্তিস্বাধীনতা: ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের সুরক্ষায় পশ্চিমা আইন প্রণীত।
শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন প্রয়োগ করা হয়।
উদারনৈতিকতা: পশ্চিমা আইন উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে আইন দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়।

ইসলামী আইন:
ন্যায়বিচার: ইসলামী আইনের মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
সামাজিক দায়িত্ব: ব্যক্তি ও সমাজের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় শরীয়াহ কার্যকর।

আত্মশুদ্ধি: ইসলামী আইন মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপরও গুরুত্ব দেয়।

৩. আইনের প্রয়োগ পদ্ধতি

পশ্চিমা আইনের প্রয়োগ:
সংবিধান ও প্রতিষ্ঠান: সংবিধান, আদালত, এবং সংসদীয় প্রক্রিয়া পশ্চিমা আইন বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম।
স্বাধীন বিচারব্যবস্থা: বিচারব্যবস্থা আইন রক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভূমিকা পালন করে।
মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি: অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর উভয়ের অধিকারকে আইনের আওতায় গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইসলামী আইনের প্রয়োগ:
শরীয়াহ আদালত: শরীয়াহ আইন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শরীয়াহ আদালতের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
নৈতিক নিয়ন্ত্রণ: ইসলামি আইন প্রয়োগে ব্যক্তিগত নৈতিকতা এবং ধর্মীয় দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শাস্তি ও ক্ষমার ভারসাম্য: ইসলামী আইনে শাস্তির পাশাপাশি ক্ষমার সুযোগ রাখা হয়েছে। যেমন, হুদুদ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর ক্ষমার অধিকার রয়েছে।

৪. সামাজিক প্রভাব

পশ্চিমা আইন:
সমতার ধারণা: আইন সবার জন্য সমান, তবে সামাজিক শ্রেণি ও অর্থনৈতিক ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে।
সাম্প্রতিক উদ্ভাবন: প্রযুক্তি ও পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব পশ্চিমা আইনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

ইসলামী আইন:

অপরাধ প্রতিরোধ: ইসলামী আইন কঠোর শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে কাজ করে।
সামাজিক সংহতি: শরীয়াহর বিধান সামাজিক সংহতি ও ধর্মীয় ঐক্য বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে।
পরিবারকেন্দ্রিক নীতি: ইসলামী আইন পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

৫. সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

পশ্চিমা আইন:
মূল্যবোধের সংকট: উদারনৈতিকতার কারণে অনেক সময় সামাজিক মূল্যবোধ উপেক্ষিত হয়।
বিশ্বব্যাপী বৈষম্য: পশ্চিমা আইনি কাঠামো বিভিন্ন দেশে বৈষম্যমূলক প্রভাব ফেলে।

ইসলামী আইন:
অভ্যাসগত বাধা: অনেক দেশে শরীয়াহর প্রয়োগ সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।
সমসাময়িক প্রেক্ষাপট: আধুনিক যুগের নতুন সমস্যার সমাধানে ইসলামী আইনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়।
পশ্চিমা ও ইসলামী সভ্যতার আইনি ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও উভয়ের উদ্দেশ্য সমাজে শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। পশ্চিমা আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর বেশি জোর দেয়, যেখানে ইসলামী আইন সামাজিক দায়িত্ব এবং ধর্মীয় নৈতিকতাকে অগ্রাধিকার দেয়। এই দুই ব্যবস্থার তুলনা তাদের মৌলিক নীতির বৈচিত্র্য ও প্রাসঙ্গিকতাকে উপলব্ধি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৪.৪ উভয় সভ্যতার উপর উপনিবেশবাদের প্রভাব

উপনিবেশবাদ পশ্চিমা এবং ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এটি মূলত পশ্চিমা সভ্যতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ছিল। এই প্রক্রিয়ার ফলে ইসলামী সভ্যতা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পশ্চিমা শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। উভয় সভ্যতার উপর উপনিবেশবাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গেলে রাজনৈতিক কাঠামো, সামাজিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক শোষণ, এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলো বিবেচনা করতে হয়।

১. উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

উপনিবেশবাদ বলতে শক্তিশালী রাষ্ট্রের দুর্বল রাষ্ট্র বা অঞ্চলের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়।

পশ্চিমা সভ্যতার ভূমিকা:
ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ানো, কাঁচামাল সংগ্রহ, এবং নতুন বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ইসলামী সভ্যতার প্রভাবিত অঞ্চল:
মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, এবং আফ্রিকার অনেক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল উপনিবেশবাদের শিকার হয়।

২. ইসলামী সভ্যতার উপর উপনিবেশবাদের প্রভাব:

রাজনৈতিক প্রভাব:

খিলাফতের পতন: উপনিবেশবাদ ইসলামী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতন ছিল এর প্রধান উদাহরণ।
জাতিগত বিভাজন: মুসলিম অঞ্চলগুলোকে কৃত্রিম সীমানায় বিভক্ত করা হয়, যেমন সাইকস-পিকো চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য বিভক্ত করা।
স্থানীয় শাসকদের দুর্বলকরণ: পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলিম নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করে বা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

অর্থনৈতিক প্রভাব:

সম্পদের শোষণ: মুসলিম দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন তেল, খনিজ এবং কৃষিপণ্য, ইউরোপীয় দেশগুলো দ্বারা লুট করা হয়।
অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা: মুসলিম অঞ্চলগুলোকে পশ্চিমা অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়।
শ্রম শোষণ: উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোতে সস্তা শ্রম এবং দাসপ্রথা ব্যবহার করা হয়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব:

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব: উপনিবেশবাদী শক্তি মুসলিম সমাজে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি প্রবর্তন করে। ইসলামী শিক্ষার স্থান দখল করে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা।
ধর্মীয় বিভাজন: মুসলিম সমাজে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে ধর্মীয় ঐক্য নষ্ট করা হয়।
ভাষার আধিপত্য: স্থানীয় ভাষার ওপর ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. পশ্চিমা সভ্যতার উপর উপনিবেশবাদের প্রভাব:

অর্থনৈতিক প্রভাব: উপনিবেশবাদ পশ্চিমা দেশগুলোর শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত কাঁচামাল পশ্চিমা শিল্পায়নে ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্যিক আধিপত্য: পশ্চিমা শক্তিগুলো উপনিবেশগুলোর বাজারে একচেটিয়া বাণিজ্য চালায়। ফলে দ্রুত লাভজনক উন্নতি হতে থাকে।

রাজনৈতিক প্রভাব:
উপনিবেশ পরিচালনার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতার প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত সম্পদ পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক শক্তিকে আরও সুসংহত করে।

সাংস্কৃতিক প্রভাব:
মিশনারি কার্যক্রম: পশ্চিমা মিশনারি উপনিবেশিত অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য কাজ করে।

বর্ণবাদ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ: উপনিবেশবাদ:
পশ্চিমা সমাজে বর্ণবাদ ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধকে বাড়িয়ে তোলে।
ডারউইন মনে করতেন সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান রা অন্যদের তুলনায় উন্নত। "কালো চামড়ার মানুষেরা নিম্নজাত ও তুলনামূলক কম বিবর্তিত বিধায় অনুন্নত" [৬]
ডারউইনের এই চিন্তা সামপ্রদায়িকতা কে উস্কে দেয় ও এর মাধ্যমে প্রশস্ত পায় সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের পথ।

নেতিবাচক প্রভাব:
আধুনিক ইউরোপ জন্ম দিয়েছে বেশ কয়টি সম্রাজ্য ও উপনিবেশিক শক্তি। স্পেনীয় সম্রাজ্য, পর্তুগিজ,ফরাসি, ব্রিটিশ, জার্মান নাজী সম্রাজ্য, কমিউনিস্ট, রুশ, ইতালী, ডাচ ইত্যাদি। এদের বর্বরতা প্রমাণ করে পাশ্চাত্য সভ্যতা কতটা পাষবিক হতে পারে, মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৪. উভয় সভ্যতার জন্য উপনিবেশবাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

পশ্চিমা সভ্যতার জন্য: উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন: উপনিবেশবাদ পশ্চিমা সভ্যতার শিল্প, প্রযুক্তি এবং অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।

নৈতিক চ্যালেঞ্জ: মধ্যযুগের শেষ দিকে মানুষ জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বস্তুগত ভোগ বিলাসের চিন্তায় নিমজ্জিত হতে থাকে। তখন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষমতার লাগাম পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায় ফলে দ্রুত ব্যবসা বানিজ্য ও জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও উপনিবেশবাদ পশ্চিমা সমাজে মানবাধিকারের ধারণার বিরোধিতা করে এবং ঐতিহাসিক অন্যায়ের জন্য নৈতিক দায় তৈরি করে।

ইসলামী সভ্যতার জন্য: রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: উপনিবেশবাদের পরিণামে মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক বিভাজন ও সংঘাত বৃদ্ধি পায়।

সাংস্কৃতিক সংকট: ইসলামী ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলন: উপনিবেশবাদ মুসলিম দেশগুলোতে স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্ভব ঘটায়, যেমন ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন।

উপনিবেশবাদ পশ্চিমা এবং ইসলামী সভ্যতার ওপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমা সভ্যতা উপনিবেশবাদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, অন্যদিকে ইসলামী সভ্যতা উপনিবেশবাদের শোষণ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের শিকার হয়। যদিও উপনিবেশবাদের যুগ শেষ হয়েছে, এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব উভয় সভ্যতায় এখনও বিদ্যমান।

অধ্যায় ৫: সমাজ ও সামাজিক কাঠামো

সমাজ এবং সামাজিক কাঠামো কোনো সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সভ্যতার চিন্তা ও মূল্যবোধ সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার সামাজিক কাঠামো একে অপরের থেকে ভিন্ন, কারণ তাদের দার্শনিক ভিত্তি, ধর্মীয় নীতিমালা, এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আলাদা।

৫.১: পশ্চিমা সমাজে পরিবার ও লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা

পশ্চিমা সভ্যতার সামাজিক কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরিবার এবং লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা। সময়ের সাথে পশ্চিমা সমাজে পরিবার এবং লিঙ্গভূমিকার সংজ্ঞা ও প্রভাব ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে।

৫.১.১: পরিবারের গঠন ও বিবর্তন

পশ্চিমা সমাজে পরিবারের ঐতিহ্যিক গঠন প্রাথমিকভাবে ইহুদি-খ্রিস্টান মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এটি ছিল একটি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো, যেখানে পুরুষ ছিলেন পরিবারের প্রধান এবং নারীদের ভূমিকা ছিল সন্তান লালন-পালন এবং গৃহস্থালি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে, আধুনিককালে পরিবার গঠনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা

১. পারিবারিক সংকটঃ পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদ ও বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তা পরিবার বিলুপ্তির উস্কানি হিসেবে কাজ করছে। ধর্ম থেকে সরার কারণেও এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।
২. একক পরিবার (Nuclear Family): শিল্পবিপ্লব এবং নগরায়ণের ফলে যৌথ পরিবারের ধারণা থেকে একক পরিবারের দিকে স্থানান্তর ঘটে। স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত ছোট পরিবার পশ্চিমা সমাজে প্রাধান্য পেয়েছে।

২. বিবাহের বৈচিত্র্য:
পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পশ্চিমা দেশগুলো ভয়াবহ যৌন লালসার জরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একসময় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বৈধতা লাভ করে।বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে বিয়ের প্রতিষ্ঠানটি অনেক বেশি উদার ও বহুমাত্রিক।যেমন সমলিঙ্গ বিবাহ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, এবং একক মাতৃত্ব/পিতৃত্ব সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

৩. সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি:
সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালনের ক্ষেত্রে আর্থিক ও মানসিক প্রস্তুতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনেকেই সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে সাবধানী সিদ্ধান্ত নেন বা সন্তানহীন জীবনযাপন বেছে নেন।

৫.১.২: লিঙ্গভূমিকার বিবর্তন

পশ্চিমা সমাজে লিঙ্গভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক আলোচনা এবং পরিবর্তন হয়েছে। নারীদের অধিকারের জন্য বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লিঙ্গভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে নারী অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে নারীকে ভোগবিলাসের সামগ্রী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

১. ঐতিহ্যিক লিঙ্গভূমিকা:
ঐতিহ্যগতভাবে, পুরুষরা অর্থনৈতিক যোগানের দায়িত্ব পালন করতেন এবং নারীরা গৃহস্থালি কাজ ও সন্তানদের দেখাশোনা করতেন। এ ধারা শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত প্রবল ছিল।

২. নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাব:
নারীবাদী আন্দোলনের তিনটি ঢেউ পশ্চিমা সমাজের লিঙ্গভূমিকার পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।
প্রথম ঢেউ নারীদের ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিল।
দ্বিতীয় ঢেউ নারীদের কর্মক্ষেত্রে সমান অধিকার এবং সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করেছে।
তৃতীয় ঢেউ লিঙ্গ পরিচয় এবং নারী স্বাধীনতার বিস্তৃত ধারণা তুলে ধরেছে।

৩. কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ:
আজকের পশ্চিমা সমাজে নারীরা কর্মক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ করছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সফলতা নারীভোগবাদিতার দিকে নিয়ে গেছে ।

৫.১.৩: লিঙ্গ-পরিচয় ও স্বাধীনতা

পশ্চিমা সমাজে লিঙ্গ-পরিচয় এবং লিঙ্গভিত্তিক স্বাধীনতার ধারণা তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এটি দ্রুত সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

১. লিঙ্গ বৈচিত্র্য:

পশ্চিমা সমাজে কেবল পুরুষ এবং নারীর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। তৃতীয় লিঙ্গ, অ-বাইনারি, এবং ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের জন্য আইনি স্বীকৃতি এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বাড়ছে। সমকামীরা ছেলে থেকে মেয়ে হচ্ছে, মেয়ে থেকে ছেলে হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ।

২. লিঙ্গ পরিচয়ের স্বাধীনতা:

লিঙ্গ পরিচয় এবং যৌন অভিমুখিতা ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। সমকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলোকে এখন অধিকাংশ পশ্চিমা দেশে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এমনকি এটাকে নরমালাইজ করতেও রীতিমত কিছু সামাজিক অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে ।যেমন হোমোফোবিয়া। সমকামীদের ঘৃণার চোখে দেখাকে বলা হচ্ছে হোমোফোবিয়া। সমকামীদের যে ব্যক্তি ঘৃণার চোখে দেখবে তাদের নাম হোমোফোবিক। তাদের কে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হতো।

৩. পরিবার গঠনে লিঙ্গ বৈচিত্র্য:

সমলিঙ্গ বিবাহিত দম্পতি পরিবার গঠনের সুযোগ পাচ্ছে। সন্তান দত্তক নেওয়া এবং আইভিএফের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমলিঙ্গ দম্পতিদের পরিবার গঠন সহজতর হয়েছে।

৫.১.৪: সমালোচনা

পশ্চিমা সমাজে পরিবার এবং লিঙ্গভূমিকার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, তা যেমন স্বাধীনতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, তেমনি সমালোচনার মুখেও পড়েছে। পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করেছে বলে অনেকেই মনে করেন। লিঙ্গভিত্তিক স্বাধীনতা সমাজে ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে বলে সমালোচনা রয়েছে। অতিরিক্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা সামাজিক দায়িত্ববোধকে কমিয়ে দিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। পশ্চিমা সমাজে পরিবার এবং লিঙ্গভূমিকার পরিবর্তন উদারনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন। তবে, এর দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রভাব নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে।

৫.২: ইসলামী সমাজে পরিবার ও লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা

ইসলামী সমাজে পরিবার এবং লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা কুরআন, হাদিস, এবং ইসলামী আইনের (শরীয়াহ) নির্দেশনার আলোকে গঠিত। ইসলামে পরিবারকে একটি পবিত্র এবং মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে প্রত্যেক সদস্যের নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামী সামাজিক কাঠামোতে লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা, ন্যায়বিচার, এবং পরিপূরক সম্পর্ক। একটি পরিবারের ভরণপোষণ আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের উপর ন্যস্ত করেছেন, যেমন কুর'আনে বেশিরভাগ স্থানে নারীকে সম্বোধন করার পরিবর্তে পুরুষকে সম্বোধন করে বলেছেন তোমরা তোমাদের স্ত্রী,বোন, কন্যা ,অধিনস্ত নারীদের বলো। আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায় ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের অধিনস্ত করেছে ।

কুরআনে নারীদের সম্পর্কে কিছু আয়াত এমন আছে, যেগুলোতে পুরুষদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং নারীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আন-নিসা (৪:৩৪): তে আল্লাহ বলেছেন,

" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"ۚ

"পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাদের অর্থ ব্যয় করার কারণে।"

এই আয়াত থেকে "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব রাখে" বা "তারা নারীদের অভিভাবক" বলে বোঝানো হয়েছে। তবে এই কর্তৃত্বের অর্থ শোষণ বা দমন নয়। এটি দায়িত্বশীলতা এবং নারীর অধিকার রক্ষা ও তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পুরুষের উপর একটি দায়িত্ব আরোপ করে।

৫.২.১: ইসলামী সমাজে পরিবারের গুরুত্ব

ইসলামে পরিবারকে মানবজীবনের মৌলিক ভিত্তি এবং সামাজিক শৃঙ্খলার কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। পারিবারিক বন্ধনকে আল্লাহর দেওয়া এক নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়, যা পারস্পরিক ভালবাসা, দায়িত্ববোধ, এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

১. বিবাহের ভূমিকা:
বিবাহের গুরুত্ব: ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি (নিকাহ) এবং এটি পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি। এটি কেবল দুই ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক নয়, বরং একটি সামাজিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক: ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এটি সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।
আল্লাহ তায়ালা কুর'আনে বলেছেন,

" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"
"আর তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল কাজ এবং খুবই নিকৃষ্ট পথ।"
সূরা আল-ইসরা (১৭:৩২)

২. পরিবারের গঠন:
ইসলামী সমাজে পরিবারের কাঠামো সাধারণত বর্ধিত পরিবার (extended family) ধারণার ওপর ভিত্তি করে। এতে স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, এবং নিকটাত্মীয়দের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

৩. সন্তান লালন-পালন:
সন্তানকে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষায়, বিশুদ্ধ ইমান ও আকিদায় তরবিয়াত করার দায়িত্ব বাবা-মায়ের ওপর বর্তায়। পিতামাতা সন্তানের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং তাদের আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করেন।

৫.২.২: লিঙ্গভূমিকার ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী সমাজে লিঙ্গভূমিকার ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার এবং পরিপূরকতা। পুরুষ এবং নারী উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তারা নিজ নিজ ভূমিকার মাধ্যমে একে অপরকে সম্পূর্ণ করে।

১. পুরুষের ভূমিকা:
পুরুষকে পরিবার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, "পুরুষগণ নারীদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, কেননা আল্লাহ একের ওপর আরেককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং কেননা তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।" (সূরা আন-নিসা: ৩৪)

পুরুষের দায়িত্ব হলো পরিবারের আর্থিক যোগান দেওয়া, স্ত্রী ও সন্তানদের দেখভাল করা, এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল, এবং একজন নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল।" (বুখারি, ৮৯৩)

এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং পারস্পরিক নির্ভরতার গুরুত্ব তুলে ধরে।

২. নারীর ভূমিকা:
ইসলামে নারীদের ওপর পরিবারের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তবে এটি তাদের জন্য সীমাবদ্ধতা নয়, বরং তাদের সুরক্ষা এবং মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে।

নারীকে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,
"জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।"

৩. পুরুষ ও নারীর পরিপূরক সম্পর্ক:
ইসলামে পুরুষ এবং নারীর সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তাদের ভূমিকা ভিন্ন হলেও উভয়ের দায়িত্ব একে অপরকে সমর্থন এবং রক্ষা করা।
আল্লাহ বলেন,
"তারা তোমাদের পোশাক, এবং তোমরা তাদের পোশাক।"
সূরা আল-বাকারা (২:১৮৭)

"পোশাক" দ্বারা বোঝানো হয়েছে পারস্পরিক সুরক্ষা, আড়াল, এবং সৌন্দর্য। এই দৃষ্টান্তে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এবং একে অপরের অপরিহার্যতা প্রকাশিত হয়েছে।

৫.২.৩: নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলামে নারীর প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ দিকনির্দেশনা রয়েছে।

১. শিক্ষার অধিকার:
ইসলামে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মহানবী (সা.) বলেছেন,
“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।”

২. সম্পত্তির অধিকার:
নারীরা সম্পত্তি অর্জন, অধিকারভোগ, এবং তা ব্যবহারের স্বাধীনতা ভোগ করেন। কুরআনে নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং অধিকার স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

৩. কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ:
ইসলামে নারীরা কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে তা অবশ্যই ধর্মীয় সীমারেখার মধ্যে হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে খাদিজা (রা.) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন।

৫.২.৪: সামাজিক সম্পর্ক ও নৈতিকতা:

ইসলামী সমাজে সামাজিক সম্পর্ক এবং নৈতিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

১. পরিবারের প্রতি দায়িত্ব:
সন্তানের দায়িত্ব বাবা-মায়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং তাদের যত্ন নেওয়া।
কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,
"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করো এবং পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করো।" (সূরা বনি ইসরাঈল: ২৩)
২. লিঙ্গ সম্পর্কিত শালীনতা:
ইসলামী সমাজে শালীন পোশাক এবং পারস্পরিক সম্মান সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার মূলনীতি। নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য শালীনতার বিধান রয়েছে।

৫.২.৫: সমালোচনা এবং চ্যালেঞ্জ

ইসলামী সমাজে পরিবার এবং লিঙ্গভূমিকা নিয়ে পাশ্চাত্য সমাজে কিছু সমালোচনা এবং চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান আছে।

১. অব্যবহৃত অধিকার:
ইসলামী নীতিতে নারীদের অধিকারের স্বীকৃতি থাকলেও অনেক মুসলিম সমাজে এই অধিকারগুলো প্রয়োগ করা হয় না।

২. আধুনিকতার সাথে সংঘাত:
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী লিঙ্গভূমিকা এবং পারিবারিক কাঠামো কখনো কখনো পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের সাথে সংঘর্ষে আসে।
ইসলামী সমাজে পরিবার এবং লিঙ্গভূমিকা একটি পবিত্র, ভারসাম্যপূর্ণ, এবং সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে দায়িত্বশীলতা এবং নৈতিকতা নিশ্চিত করে। তবে, ইসলামী সমাজের নীতিগুলোকে সময়োপযোগী করে বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব।

৫.৩: সামাজিক কাঠামোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পশ্চিমা ও ইসলামী সভ্যতার সামাজিক কাঠামো একে অপর থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন, যদিও উভয়েই মানবসমাজের শৃঙ্খলা, সম্পর্ক, এবং নৈতিকতা বজায় রাখতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

৫.৩.১: পরিবার গঠনের মধ্যে পার্থক্য

১. পশ্চিমা সমাজে পরিবার গঠন:
পশ্চিমা সমাজে পরিবার গঠনে প্রচলিত ধারণা বেশ পরিবর্তনশীল। ঐতিহাসিকভাবে, পশ্চিমা সমাজে পরিবার ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক, তবে আধুনিক সময়ে একক পরিবারের (nuclear family) ধারণা আরও প্রাধান্য পেয়েছে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে একটি ছোট পরিবার গঠন করা হয়। এছাড়া, পশ্চিমা সমাজে সমলিঙ্গ বিবাহ, একক পিতামাতা, এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি পরিবার গঠনের বৈচিত্র্য এবং মুক্ত চিন্তার প্রতিফলন।

২. ইসলামী সমাজে পরিবার গঠন:
ইসলামী সমাজে পরিবার গঠনের মূল ধারণা হলো পবিত্র সম্পর্ক এবং ধর্মীয় দায়িত্ববোধ। এখানে পরিবার সাধারণত একক পরিবারের পাশাপাশি বর্ধিত পরিবারের

(extended family) ধারণায় গড়ে ওঠে, যেখানে স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দায়িত্বশীলতা এবং সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইসলামে পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে যৌথ জীবনের গুরুত্ব এবং পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার ধারণা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

তুলনা:

পশ্চিমা সমাজে পরিবারের ধারণা পরিবর্তনশীল এবং উদার যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়। এমনকি সেখানে পরিবার গঠনের মধ্যেও উদাসীনতা বিদ্যমান এবং একা থাকার মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করার প্রবণতা বেশি।

ইসলামী সমাজে, পরিবার একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান এবং এর গঠন দৃঢ় সামাজিক এবং ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে হয়, যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা ও সম্মান সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

৫.৩.২: লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা এবং সামাজিক অবস্থান

১. পশ্চিমা সমাজে লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা:
পশ্চিমা সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ এবং নারীদের ভূমিকা ছিল বেশ নির্দিষ্ট—পুরুষরা ছিলেন প্রধান অর্থনৈতিক রূপে এবং নারীরা গৃহস্থালি কাজ ও সন্তান পালন করতেন। তবে আধুনিককালে, নারীবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের অধিকারের জন্য ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।
তবে ফেমিনিজমের নামে নারীরা ভোগবাদিতায় মিশে গেছে। যার ফলে পাশ্চাত্য পরিবারের নারীরা অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। যদিও এর মূলে পুরুষদের দায়িত্ববোধের অভাব প্রভাব ফেলছে ।

"সেক্যুলার সংস্কৃতিতে নারীদের শান্তি, সম্মান মর্যাদা উন্নতি নিশ্চিত করার বিষয়ে পুরুষ কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না। এ কারণে নারী তার সার্থের পিছনে ছুটতে বাধ্য হয়।" [৭]

এছাড়া, সমলিঙ্গ বিবাহ এবং ট্রান্সজেন্ডার অধিকারও পশ্চিমা সমাজে একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

২. ইসলামী সমাজে লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা:
ইসলামী সমাজে পুরুষ এবং নারীর ভূমিকা পরিপূরক, তবে তাদের দায়িত্ব আলাদা। পুরুষকে পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়, এবং নারীর দায়িত্ব হলো গৃহস্থালি কাজ, সন্তান পালন এবং পরিবারে নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তবে, ইসলামে নারীদের সম্পত্তির অধিকার,মত প্রকাশের অধিকার, শিক্ষার অধিকার নিয়ে বাধা সৃষ্টি করে না, যেটা পাশ্চাত্য আমাদের সামনে ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

তুলনা:
পশ্চিমা সমাজে লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা অনেকটাই সমান এবং নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করছে। স্বআর্থবাদিতা, ভোগবাদিতা বেশি লক্ষণীয়।

ইসলামী সমাজে, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা যথাযথভাবে নির্ধারিত, যেখানে পুরুষ এবং নারীর দায়িত্ব একে অপরকে পরিপূরক এবং সম্মানজনক ।

৫.৩.৩: সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

১. পশ্চিমা সমাজে ধর্ম এবং নৈতিকতা:
আধুনিক পশ্চিমা সমাজে ধর্মীয় প্রভাব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে এবং এটি এখন সেক্যুলার ও উদারনৈতিক সমাজে পরিণত হয়েছে। এখানকার নৈতিকতা প্রধানত ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার, এবং সমাজের জন্য একে অপরের প্রতি দায়িত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা, এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যে সীমারেখা ছিল, তা এখন অনেকটাই ধুমিল হয়ে গেছে। উদ্ভব হয়েছে লিবারিজম, সেক্যুলারিজম,হিউম্যানিজম, ফেমিনিজম। ”সেক্যুলারিজম রেনেসাঁ পরবর্তী বিকাশ ঘটে যা মানুষকে বস্তুবাদ ও পার্থিব উন্নতির আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণের দিকে ঝুকিয়ে দেয় যা ধর্মীয় ধ্যান ধারণাকে হ্রাস করে দেয়।” [৮] এমনকি নীতিগত শিথিলতা দেখা যায়।

২. ইসলামী সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক কাঠামো:
ইসলামী সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক কাঠামো কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এটি একটি সামগ্রিক কাঠামো, যা ব্যক্তি, পরিবার, এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে আল্লাহর আইন অনুসারে পরিচালিত হয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং নৈতিক নির্দেশনা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

“ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি হলো আখিরাতের জবাবদিহিতা। মানুষ দুনিয়ায় যা করে এর ফল মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পাওয়া যাবে এটাই মূল বিশ্বাস। আর আল্লাহর ভয় ছাড়া কোনো মানুষ পরিপূর্ণ নৈতিক চরিত্রের হতে পারেনা।” [৯]

তুলনা:

পশ্চিমা সমাজে ধর্মের প্রভাব কমে যাওয়ার কারণে নৈতিকতা অনেকটাই সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে, যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার প্রধান।

ইসলামী সমাজে, নৈতিকতা এবং সামাজিক কাঠামো মূলত ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যেমন,
"ইসলামে honesty is a value আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় honesty is a policy অর্থাৎ ইসলামে সর্বাবস্থায় সততা অবলম্বন করতে হবে আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় নীতি হিসেবে সততাকে লাভজনক বলে গ্রহণ করা হয়।"[১০]
তারমানে দাঁড়ায় উন্নতির জন্য নীতি হিসেবে সততা প্রয়োজন তবে ধরা পড়ার আশংকা না থাকলে জরুরি নয়।

৫.৩.৪: সামাজিক পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ

১. পশ্চিমা সমাজে সামাজিক পরিবর্তন:
পশ্চিমা সমাজে সামাজিক পরিবর্তন এবং অগ্রগতির প্রতি একটি খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যেখানে নতুন আইডিয়াগুলি সহজেই গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সমলিঙ্গ বিবাহ, নারীদের অধিকার, এবং লিঙ্গ পরিচয়ের বিষয়ে পশ্চিমা সমাজ একটি উদারনীতি অনুসরণ করেছে। তবে, এই পরিবর্তনগুলি কখনও কখনও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বা পারিবারিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে।

২. ইসলামী সমাজে সামাজিক পরিবর্তন:
ইসলামী সমাজে, পরিবর্তনকে সাধারনত ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ইসলামী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রহণ করা হয়। যদিও ইসলামী সমাজে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তবে এটি সাধারণত ধর্মীয় আদর্শ এবং শালীনতা ঠিক রেখে।

তুলনা:
পশ্চিমা সমাজে সামাজিক পরিবর্তন সহজ এবং দ্রুত হয়, যেখানে উদারনৈতিক ধারণাগুলির প্রতিফলন দেখা যায়। ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রাধান্য পাওয়ায় সমাজ ব্যবস্থায় বৈচিত্র দেখা যায়।

ইসলামী সমাজে, সামাজিক পরিবর্তন সাধারণত ইসলামী দৃষ্টিকোণ এবং ধর্মীয় নীতির সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করা হয়, যা আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্য বজায় রাখে তবে তা ধর্মীয় অনুশাসনের সীমারেখার ভেতরে।

পশ্চিমা এবং ইসলামী সভ্যতার সামাজিক কাঠামোর তুলনা আমাদের দুটি সভ্যতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এবং মিলগুলো বুঝতে সাহায্য করে। পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদারনীতি, এবং ধর্মীয় প্রভাবের অবক্ষয় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়, যেখানে ইসলামী সমাজে পরিবার, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা, এবং সামাজিক সম্পর্ক ধর্মীয় নীতিমালা ও শৃঙ্খলার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাদের সামাজিক কাঠামো অনেকটা বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের প্রতিফলন।

অধ্যায় ৬: দার্শনিক ও নৈতিক পার্থক্য

৬.১ পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধর্মের ভূমিকা

ধর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব:

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধর্মের ভূমিকা সীমিত এবং ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেক্যুলারিজমের প্রভাবে ধর্মকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে পৃথক করা হয়েছে।পাশ্চাত্যে দীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের ইতিহাস রয়েছে, যেমন ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্টের মধ্যে লড়াই, যা সমাজের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করেছিল। এই ধরনের অস্থিরতা ধর্মের সমাজে প্রভাব কমানোর একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর পরিণতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্ম থেকে পৃথকীকরণের ধারণা জনপ্রিয় হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

পাশ্চাত্যের মধ্যযুগে চার্চের প্রভাব অত্যধিক ছিল, যা রেনেসাঁ এবং এনলাইটেনমেন্টের পর ক্রমশ হ্রাস পায়। ফলে, ধর্মকে দার্শনিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। “১৭শ শতকের শেষাংশে উদারনীতির আবির্ভাব হয়, যা স্বাধীনতা, সমতা, এবং মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেয়। উদারপন্থীরা ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেন। এতে ধর্মীয় প্রভাব সমাজে হ্রাস পায় এবং মানবতার কল্যাণে ধর্মের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।”[১১]

ধর্মীয় সংকট:

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধর্মীয় চর্চার প্রতি আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখার কারণে এটি সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভূমিকা হারিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে এসে ধর্মের বৈচিত্র্য ও বিকৃতি ঘটেছে। একপর্যায়ে সেক্যুলারিজম এর উদ্ভব ঘটে ধর্ম চর্চার বিলুপ্তি ঘটে ।

মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি:
পাশ্চাত্যের দর্শনে মানবকেন্দ্রিকতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ, যা ধর্মীয় বিধিনিষেধের চেয়ে ব্যক্তির ইচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এ ধারণা থেকে হিউম্যানিজম বা মানববাদের উদ্ভব।

“আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান বিষয় হিউম্যানিজম বা মানববাদ। এটিকে মানববাদ না বলে মানবপূজা বলা যায়। হিউম্যানিজম মূলত ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার মৌলিক ধারণা। পুরো পশ্চিমা সভ্যতা ও পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে এই চিন্তার উপর।” [১২]

৬.২ ইসলামী সভ্যতায় ধর্মের ভূমিকা

সর্বজনীন নির্দেশনা:
ইসলামে ধর্ম (ইসলাম) ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করে। এটি শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য সমাধান দেয়। আল্লাহ কুর'আনে বলেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছি, এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছি।" (সূরা আল-মায়িদা, ৫: ৩)

ঐতিহাসিক ভূমিকা:
ইসলামী সভ্যতার প্রতিটি যুগে ধর্ম সমাজ এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মদিনা সনদের মাধ্যমে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের মডেল প্রতিষ্ঠিত হয়।

নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা:
ইসলামে ধর্ম মানুষের নৈতিক উন্নতি, সামাজিক শৃঙ্খলা, এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে।আল্লাহ বলেন,
"তোমরা পরিপূর্ণভাবে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হও, যেমন আল্লাহ তোমাদের জন্য আদেশ করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা, ২: ১৯৭)

"এবং তোমরা পরস্পরকে মিথ্যা বা অন্যায়ভাবে কোন কিছু গ্রহণ করো না, আর কোন মানুষকে তার অধিকার ছাড়া কিছু দাও না।" (সূরা আল-বাকারা, ২: ১৮৮)

আধ্যাত্মিক ও দুনিয়াবি ভারসাম্য:
ইসলামী সভ্যতায় আধ্যাত্মিকতা এবং দুনিয়াবি জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। ধর্ম শুধু আখিরাতের জন্য নয়, দুনিয়ার কল্যাণের জন্যও পথপ্রদর্শক। আল্লাহ বলেন,

"এবং আল্লাহর দানে যা তোমাদের রয়েছে, তাতে পরকালকে সন্ধান করো, কিন্তু পৃথিবীর দুনিয়াতে তোমাদের ভাগ্য থেকে কিছু ভুলে না যাও।" (সূরা আল-কাহফ, ১৮: ১০৪)

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য পরকালীন জীবন আরও ভালো এবং তাদের জন্য তা চিরকাল থাকবে।" (সূরা আল-কাহফ, ১৮: ১০৭)

এ দুটি আয়াতে বোঝা যায়, মুসলিমদের উচিত পৃথিবীজগতের দিক থেকেও নিজেদের প্রয়োজন মেটানো, কিন্তু তার সাথে পরকালের জন্য প্রস্তুতিও নিতে হবে। অর্থাৎ, পৃথিবী ও পরকাল—দুইয়ের মধ্যেই ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। এছাড়াও দুনিয়ার সৎকর্ম সেটা দুনিয়াবি হলেও আখিরাতে প্রতিদান থাকবে।

শাসনব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকা:
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরীয়াহ আইন প্রণয়ন এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন,
"এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার করার জন্যে তোমার কর্তব্য হল।" (সূরা আল-বাকারা, ২: ২৪৪)

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর জন্য সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ হতে চেষ্টা করো এবং মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো।" (সূরা আন-নিসা, ৪: ৫৮)

৬.৩ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ

৬.৩.১ পাশ্চাত্য সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

আপেক্ষিক নৈতিকতা:
পাশ্চাত্য সভ্যতায় নৈতিকতা সময়, সমাজ, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। এখানে কোনো সর্বজনীন নৈতিক মান নেই।

যৌক্তিকতা ও প্রজ্ঞা:
পাশ্চাত্য নৈতিকতা যুক্তি এবং মানববুদ্ধির ওপর নির্ভর করে, যা প্রায়ই ধর্মীয় নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমনকি যুক্তিবাদ নিজের সেচ্ছাচারিতা ও সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল।

"যুক্তিবাদ ও প্রকৃতিবাদ এ দুটি জিনিসের প্রচারণা পাশাচত্যবাদীরা দুই শতক ধরে করে আসছে। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি যুক্তিবাদ বা প্রকৃতিবাদ কোনোতার উপর ই না বরং এর কাঠামো নিছক অনুভুতি, কামনা, প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত।" [১৩]

স্বাধীনতা বনাম নৈতিকতা:
পাশ্চাত্য সভ্যতা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, যা অনেক সময় সামাজিক নৈতিকতা এবং দায়িত্ববোধের অভাব তৈরি করে। "স্বাধীনতাবাদ" (Libertarianism) এমন এক চিন্তা যেখানে একটি ব্যক্তি তার জীবন পরিচালনায় স্বাধীন থাকবে এবং তার কোনো কাজের জন্য অন্যের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না যতক্ষণ না তা অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে।
পাশ্চাত্যে, মানুষ নিজের জীবনকে স্বাধীনভাবে গঠন করতে পারেন, কিন্তু এটি সামাজিক নৈতিকতার সাথে কখনো কখনো সংঘর্ষে চলে আসে। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ বা জীবনযাত্রার স্বাধীনতা সমাজের ঐতিহ্য বা ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
"প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে সে যা ভালো মনে করবে তা করতে পারবে, সমকামিতাকে ভালো মনে করলে সে তাও করতে পারবে। পুরুষকে বিবাহ করবে নাকি মহিলাকে এটা তার চয়েজ, সে পর্দা করবে নাকি করবে না এ ব্যপারে কেউ বাধ্য করতে পারবে না।" [১৪]

৬.৩.২ ইসলামী সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

সর্বজনীন নৈতিক মান:
ইসলামে নৈতিকতা আল্লাহর নির্দেশিত, যা সর্বজনীন এবং অপরিবর্তনীয়। এটি মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক, এবং সামাজিক জীবনে শান্তি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা:
ইসলামে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য। ধর্মীয় বিশ্বাস নৈতিক আচরণের মূল ভিত্তি।
"তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং উত্তম কাজ করো, যাতে তোমরা সফল হও।"
(সূরা আয-যুমার, ৩৯: ১০)
"আল্লাহর কাছে ন্যায়পরায়ণতা এবং তাকওয়া (আল্লাহভীতি) সবচেয়ে প্রিয়।"
(সূরা আল-মায়িদা, ৫: ৮)
"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকে সঠিক করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।"
(সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৭০-৭১)

সামাজিক দায়িত্ববোধ:
ইসলামে নৈতিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক দায়িত্ববোধ। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য নৈতিকতা অপরিহার্য।

"তোমরা সৎকর্মে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"
— (সুরা মায়েদা, ৫:২)"

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অন্যায়, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতার বিষয় থেকে নিষেধ করেন।"
— (সুরা নাহল, ১৬:৯০)"

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ দেখে, তবে সে তা হাত দিয়ে প্রতিহত করবে। যদি তা না পারে, তবে জিহ্বা দিয়ে প্রতিহত করবে। আর যদি সেটাও না পারে, তবে অন্তরে তা ঘৃণা করবে।"

— (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৪৯)

পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ইসলামী সভ্যতার মধ্যে দার্শনিক ও নৈতিক পার্থক্য গভীর। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবকেন্দ্রিক এবং পরিবর্তনশীল, যেখানে ইসলামী সভ্যতা আল্লাহপ্রদত্ত নির্ভরযোগ্য নৈতিক মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী সভ্যতার নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ জীবনের প্রতিটি স্তরে শৃঙ্খলা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করে, যা পাশ্চাত্যের আপেক্ষিক নৈতিকতার বিপরীত।

অধ্যায় ৭: রাজনৈতিক কাঠামো ও শাসনব্যবস্থা

৭.১ পাশ্চাত্য সভ্যতায় গণতন্ত্র এবং সেক্যুলারিজম

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য:
পাশ্চাত্য সভ্যতায় গণতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা। এটি জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, এবং জনগণের শাসনের ধারণা বহন করে।

পশ্চিমা চিন্তাবিদদের চোখে গণতন্ত্র নেহায়েত কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থা না, বরং সামাজিক আদর্শ ও দর্শনও। তারা ঘোষণা দেয়, "পশ্চিমা গণতন্ত্র সরকারব্যবস্থার গন্ডি পেরিয়ে মানবীয় সম্পর্কের সকল পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে" [১৫]

প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার গঠন।
- আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের সুরক্ষা।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা।

ইতিহাস:
প্রাচীন গ্রিসে গণতন্ত্রের উৎপত্তি হলেও, আধুনিক গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ এবং গণজাগরণের সময় বিকশিত হয়।

সেক্যুলারিজম

সংজ্ঞা:
সেক্যুলারিজম হল ধর্ম এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ। পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেক্যুলারিজম রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব কমাতে ভূমিকা রেখেছে।

"পশ্চিমা সভ্যতার মূলভিত্তি হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। তাদের ধারণা এই আদর্শ সবার গ্রহন করা উচিত,অথচ এটি সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে।" [১৬]

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র:

পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রীয় আইন এবং নীতিমালা প্রণয়ন ধর্মীয় বিধানের ওপর নির্ভরশীল নয়। এটি বিজ্ঞান এবং যুক্তিকে প্রধান ভূমিকা দেয়।

সেক্যুলারিজমের প্রভাব:

- ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
- রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব দূর করা।
- সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা।

৭.২ ইসলামী সভ্যতায় খিলাফত ও শরীয়াহ

খিলাফত

সংজ্ঞা ও ভূমিকা:
খিলাফত ইসলামের একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে শাসক আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেন।
প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে শাসন।
- ন্যায়বিচার এবং সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা।

ইতিহাস:
প্রথম খিলাফতব্যবস্থা রাশিদুন খিলাফতের মাধ্যমে শুরু হয়, যা ইসলামী শাসনের একটি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত।

শরীয়াহ

সংজ্ঞা:
শরীয়াহ হল ইসলামী আইন, যা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী মানবজীবনের সব দিক পরিচালনা করায়।

প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- কুরআন ও হাদিসের ওপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন।
- ন্যায়বিচার, সাম্য, এবং মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

শরীয়াহ শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনের নয়, বরং সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্যও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রদান করে।

৭.৩ আইনি কাঠামোর তুলনা

পাশ্চাত্য আইনি কাঠামো:

উৎস:
পাশ্চাত্যের আইন প্রণীত হয় রোমান আইন, ব্রিটিশ কমন ল, এবং রেনেসার যুগের চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে।

এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Decline and Fall of the Roman Empire"-এ জাস্টিনিয়ানের কোডের গুরুত্ব নিয়ে বলেন:

"The laws of Justinian have commanded the respect and obedience of the most distant generations."

তিনি জাস্টিনিয়ানের আইনি সংকলনকে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবশালী কাঠামো হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা পরবর্তী যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রকৃতি:

- ধর্মনিরপেক্ষ এবং পরিবর্তনশীল।
- ব্যক্তি এবং সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন।

বৈশিষ্ট্য:

- সংবিধান এবং আইনের শাসন।
- মানবাধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার অগ্রাধিকার।

ইসলামী আইনি কাঠামো:

উৎস:
ইসলামী আইন কুরআন, হাদিস, এবং ইজমা-কিয়াসের (সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও যুক্তি) ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

প্রকৃতি:

- অপরিবর্তনশীল এবং চিরন্তন।
- মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত।

বৈশিষ্ট্য:

- ঈমানের ভিত্তিতে আইন প্রয়োগ।
- নৈতিকতা এবং ন্যায্যতার অগ্রাধিকার।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ:
পাশ্চাত্য আইন সময় এবং পরিস্থিতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল হলেও, ইসলামী আইন আল্লাহর নির্দেশিত চিরন্তন বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য আইন মানবিকতাকে প্রাধান্য দিলেও, ইসলামী আইন আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দিকেও গুরুত্ব দেয়।

৭.৪ উপনিবেশবাদের প্রভাব

পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা উপনিবেশবাদ
পাশ্চাত্য সভ্যতা উপনিবেশবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতায় তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। উপনিবেশবাদী শাসনে স্থানীয় ঐতিহ্য, আইন, এবং সংস্কৃতি অনেকাংশে ধ্বংস হয়।

ইসলামী সভ্যতার ওপর উপনিবেশবাদের প্রভাব:

ইসলামী বিশ্বে উপনিবেশবাদের ফলে খিলাফতের পতন ঘটে এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। পশ্চিমা শক্তির প্রভাব ইসলামী সমাজের আইন, শিক্ষা, এবং সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে।
"মুসলিমদের উপর উপনিবেশিক শক্তিগুলো বিপরীতমুখী প্রভাব ফেলে। যেমন স্পেনে হাজারো মুসলিম কে জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানো হয়। পর্তুগিজ রা ভারতে মুসলিম দের উপর নির্যাতন চালায়।" [১৭]

উপনিবেশবাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব:

- অর্থনৈতিক শোষণ এবং দারিদ্রতা।
- সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি।
- আধুনিক রাজনৈতিক এবং শাসনব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের আধিপত্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজনৈতিক কাঠামো গণতন্ত্র এবং সেক্যুলারিজমের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হলেও, ইসলামী সভ্যতার শাসনব্যবস্থা খিলাফত এবং শরীয়াহ আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়ের মধ্যে দার্শনিক এবং কাঠামোগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। উপনিবেশবাদ এবং আধুনিকীকরণের প্রভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও, ইসলামের মৌলিক নীতিগুলো সময়ের পরীক্ষায় স্থায়ী এবং কার্যকর।

অধ্যায় ৮: অর্থনীতি ও বিজ্ঞান

৮.১ পাশ্চাত্য সভ্যতায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থনীতি মূলত ক্যাপিটালিজম এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

ক্যাপিটালিজম

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য:
পাশ্চাত্য সভ্যতায় অর্থনীতি মূলত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, মুক্তবাজারে প্রতিযোগিতা এবং লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনা করার নীতির ওপর দাঁড়িয়ে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- সম্পদের বিশেষায়িত বণ্টন।
- সরকারি হস্তক্ষেপ কমিয়ে দেওয়া এবং বাজারের শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা।
- উৎপাদন ও বাণিজ্যের মুক্ত বাজার।

উৎস:
শিল্পবিপ্লব এবং রেনেসাঁর পর পাশ্চাত্য সভ্যতায় উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক চিন্তা প্রসারিত হতে থাকে, যার মাধ্যমে ক্যাপিটালিস্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়।

“মধ্যযুগের শেষ দিকে মানুষ জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বস্তুগত ভোগ বিলাসের চিন্তায় নিমজ্জিত হতে থাকে। তখন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষমতার লাগাম পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায় ফলে দ্রুত ব্যবসা বানিজ্য ও জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং পুঁজিবাদ দেখা যায়।” [১৮]

ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং:

পাশ্চাত্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, শেয়ার বাজার এবং ঋণ নীতি অর্থনীতির কার্যকারিতা এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। আধুনিক ব্যাংকিং সিস্টেম এবং মুদ্রার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে সুদি লেনদেন যোগের মাধ্যমে বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য:
পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি গুরত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের কিছু অঞ্চলে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেও, অন্যান্য অঞ্চলে দারিদ্র্যতা ও বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮.২ ইসলামী অর্থনৈতিক নীতি

ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিগুলি কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস এবং ইসলামী স্কলারদের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত, যা ধর্মীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

ইসলামী অর্থনীতি ও ন্যায়বিচার:
ইসলামী অর্থনীতি সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সমতা, শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঋণ নীতি:
ইসলামে সুদ বা রিবাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং মানুষকে দানের মাধ্যমে একে অপরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,
"হে ঈমানদারগণ, তোমরা দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়িয়ে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"
সূরা আলে ইমরান (৩:১৩০)
জাকাত ও দান:

ইসলামী অর্থনীতিতে দানের গুরুত্ব অনেক বেশি। জাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সমাজে সমতা বজায় রাখা হয়।

"তোমরা যা সুদ হিসেবে দাও, যাতে মানুষের সম্পদে তা বৃদ্ধি পায়, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর যা তোমরা যাকাত হিসেবে দাও, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, সেটাই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।"
সূরা আর-রূম (৩০:৩৯):

"যাকাত তো কেবল গরিব, মিসকিন, যাকাত সংগ্রহকারীদের জন্য, যাদের অন্তর জয় করতে হয়, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
সূরা তওবা (৯:৬০):

ধনসম্পদ ও কাজের বৈধতা:
ইসলামে ধনসম্পদের উৎস বৈধভাবে অর্জিত হতে হবে, অর্থাৎ গুনাহ বা অন্যায় পন্থায় উপার্জন করা অনুমোদিত নয়।ব্যবসা ও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা হয়, তবে এর মাধ্যমে মানুষের অধিকার লঙ্ঘন বা প্রতারণা করা যাবে না।

"যারা আল্লাহর পথে সৎ উপার্জন করে এবং নিজের প্রাপ্য ব্যয় করে, তাদের জন্য সৎ পুরস্কার প্রস্তুত করা হয়েছে।" সূরা আল-ইনসান (৭৬:৫):
"তারা যা খায়, তা হালাল হতে হবে, যদি তারা সৎ ও ধর্মানুগতভাবে অর্জন করে।"
সূরা তওবা (৯:১০১):

হালাল উপার্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এতে সৎ উপার্জন এবং নিষিদ্ধ উপার্জন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

"যারা নিজেদের দান-খয়রাত ও ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর পথে ব্যবসা করে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার, যা তাদের সঠিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ।"
সূরা আল-আল ইমরান (৩:১৩৪):

এই আয়াত ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন এবং সেই উপার্জনকে সৎ পথে ব্যয় করার উৎসাহ দেয়।

ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য:
সম্পদের সমতা ও সামাজিক কল্যাণের ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির পরিবর্তে মানুষের কল্যাণের জন্য সততার সাথে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

৮.৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ইসলামী সভ্যতার অবদান

ইসলামী সভ্যতা মধ্যযুগে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল বিজ্ঞান, গণিত, এবং প্রযুক্তিতে। মুসলিম চিন্তাবিদরা প্রাচীন গ্রিক, পার্সিয়ান এবং ভারতীয় জ্ঞানের সমন্বয় করে নতুন যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবেরা অন্য সভ্যতার তুলনায় এগিয়ে ছিল।

"আরবরা শুধু প্রাচীন গ্রিকদের জ্ঞান বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করেনি, বরং তারা নিজেদের জন্য বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। জ্ঞান- গবেষণা ও দর্শনকে নিয়ে যায় এক অনন্য উচ্চতায়।" [১৯]

গণিত: মুসলিম বিজ্ঞানীরা যেমন আল-খোয়ারিজমি, ইসলামী গণিতে অ্যালজেব্রার সূচনা করেন, যা পশ্চিমা বিশ্বে গণিতের মৌলিক অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউরোপীয় শিক্ষায় গণিতের প্রবর্তন:
আল-খোয়ারিজমির আবিষ্কৃত অ্যালগোরিদম গণিতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গণিতের মাধ্যমে দর্শন চর্চা করতেন আল কিন্দি।

আল-বাতানী ও ইবনে আল-হাইথাম:
আল-বাতানী গ্রহের গতি এবং আল-হাইথাম আলোকবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন, যা পরবর্তীতে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা
মুসলিম চিকিৎসকরা যেমন ইবনে সিনা, আল-রাজি, আল ফারাবি এবং আল-জাহরাওয়ি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তাদের রচনা এবং চিকিৎসাবিষয়ক নথি পরবর্তীতে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়।

প্রযুক্তি:
মুসলিম বিজ্ঞানীরা কেমিস্ট্রি, পদার্থবিদ্যা এবং প্রযুক্তিতে অগ্রগতি সাধন করেছিলেন। তারা প্রথম বিশ্বব্যাপী উন্নত যন্ত্রপাতি যেমন, পণ্য পরিমাপের জন্য মাপযন্ত্র এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরি করেন।

৮.৪ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নতি

পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিকীকরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ রেনেসাঁ এবং সেকেন্ড রেভোলিউশন পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটায়।

গ্যালিলিও গ্যালিলেই, নিউটন, এবং দারউইন:
বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, নিউটন, এবং চার্লস ডারউইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে অবদান রেখে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তির উন্নয়ন
শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে, যা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করে।

অধ্যায় ৯: পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতার সংঘাতের কারণসমূহ

৯.১ আদর্শিক সংঘাত: ধর্ম বনাম সেক্যুলারিজম

ধর্মের ভূমিকায় পার্থক্য: ইসলামী সভ্যতায় ধর্ম মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নীতি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা সেক্যুলারিজমকে অগ্রাধিকার দেয়। সেক্যুলারিজম ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করে।

সত্যের উপলব্ধি: ইসলামী সভ্যতা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল একক সত্যে বিশ্বাসী। ইমানদার লোকদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তাদের কে যখন আল্লাহ ও রসুলের (সাঃ) দিকে ডাকা হবে তারা তখন বলবে 'আমরা শুনলাম এভং মেনে নিলাম' (সুরা নুর :৫১)

সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা বাস্তববাদ এবং আপেক্ষিকতার ওপর ভিত্তি করে সত্য নির্ধারণ করে।

মূল্যবোধের সংঘাত: ইসলামে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, তবে পাশ্চাত্য সেক্যুলারিজম মানবকেন্দ্রিক নীতি ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
তাদের চারটি অবাধ স্বাধীনতা-

- Freedom of faith
- Freedom of speech
- Freedom of ownership
- Personal freedom

এছাড়াও তাদের অন্যান্য নীতি Humanism,modernism, feminism যেগুলো ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

৯.২ দার্শনিক ও সামাজিক সংঘাত

৯.২.১ ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম ধর্মীয় শৃঙ্খলা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ: ইসলামে স্বাধীনতা আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে পরিচালিত হয়। এটি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ: পাশ্চাত্য সভ্যতা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দেয়, যা প্রায়শই সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করে।

সংঘাতের কারণ: পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে, যা ইসলামী শৃঙ্খলা এবং নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন সুদ, যিনা, সমকামিতা, অশ্লীলতা ব্যক্তিস্বাধীনতা্র নামে চালিয়ে যায় যা সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর।

৯.২.২ সামাজিক কাঠামো ও পরিবারের ধারণার পার্থক্য

ইসলামী সমাজ: পরিবার ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি। বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন এবং সন্তান প্রতিপালন সামাজিক দায়িত্ব।

পাশ্চাত্য সমাজ: পাশ্চাত্যে পরিবারের ধারণা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। বিবাহ, একক পিতামাতা পরিবার এবং সমলিঙ্গ বিবাহের মতো বিষয়গুলো ইসলামী পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সংঘাতের কারণ: পাশ্চাত্য মূল্যবোধ পরিবারকে ব্যক্তির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে, যেখানে ইসলামী সমাজ পারিবারিক বন্ধনকে পবিত্রতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য মনে করে।

৯.২.৩ সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংঘাত

সাংস্কৃতিক প্রভাব: পাশ্চাত্য সভ্যতা ভোগবাদ, বিলাসিতা এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে।

তাদের গ্রিক অনুকরণে সংস্কৃতি সম্পর্কে মুহাম্মদ আসাদ বলেছেন,
"ধর্ম জিনিসটা কী আদতে রোমানরা তা জানত না, তাদের প্রচলিত দেব দেবীরা ছিল গ্রিক পুরাণের অনুকরণ মাত্র। নিছজ সামাজিক রীনিনীতির সুবিধার্থে তারা এই নিস্তেজ প্রেতাত্মাগুলোকে মেনে নিয়েছিল।" [২০]

"আমেরিকার বিশিষ্ট লেখক প্যাট্রিক যে বুজানান দ্যা ডেথ অব দ্যা ওয়েস্ট শীর্ষক বইয়ে লিখেছেন, সেক্যুলারিজম ও লিবারেলিজম বিশ্বাসী লোকেরা মনে করে, এটা আমার জীবন আমিই উপভোগ করবো।" [২১]

অন্যদিকে আল্লাহ কুর'আনে বলেছেন যে, মানুষের সৃষ্টি কেবল এই দুনিয়ার জন্য নয়, বরং তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা। "আমি জীন ও মানবজাতিকে কেবল নিজেদের জন্য ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (কুর'আন 51:56)

নৈতিকতার ভিত্তি: পাশ্চাত্য সভ্যতায় নৈতিকতা আপেক্ষিক এবং সমাজের পরিবর্তনশীল মানের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে ইসলামে নৈতিকতা সর্বজনীন এবং আল্লাহর নির্ধারিত।

সংঘাতের ফলাফল: পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক ইসলামী সমাজে ভোগবাদ এবং নৈতিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ছে। এটি ইসলামের মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৯.৩ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত

রাজনৈতিক সংঘাত:
পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের খিলাফত ও শরীয়াহ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।পাশ্চাত্য শক্তি ইসলামী বিশ্বে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে চায়, যা ইসলামের স্বাধীনতার নীতির পরিপন্থী।

অর্থনৈতিক সংঘাত:
পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতি মুনাফাকেন্দ্রিক এবং সুদ-ভিত্তিক, যা ইসলামী অর্থনীতির ন্যায্য বণ্টন এবং সুদমুক্ত নীতির বিপরীত। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শক্তি ইসলামী রাষ্ট্রগুলিকে দুর্বল করে।

৯.৪ উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আধুনিক সংকট

উপনিবেশবাদের প্রভাব:
পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদ ইসলামী সভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতি, এবং শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। উপনিবেশবাদের ফলে ইসলামী সমাজে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের প্রভাব বিস্তার করে, যা ঐতিহ্যবাহী ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে।

সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিক সংকট:
পাশ্চাত্যের সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য ইসলামী দেশগুলোকে উন্নয়ন এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রেখেছে।
আধুনিক সংকট যেমন ইসলামোফোবিয়া, সন্ত্রাসবাদের অপব্যাখ্যা, এবং মিডিয়ার ভূমিকা ইসলামী সভ্যতার বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করেছে।

পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতার সংঘাত আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক স্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। ইসলামী সভ্যতা আল্লাহর নির্দেশিত নীতির ভিত্তিতে শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের কথা বলে, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মানবকেন্দ্রিকতার ওপর নির্ভরশীল। এই সংঘাত সমাধানের জন্য আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রয়োজন।

অধ্যায় ১০: ইসলামী সভ্যতা কেন পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় সর্বোত্তম

১. দার্শনিক ভিত্তি ও নৈতিকতা

ইসলামী সভ্যতা আল্লাহর নির্দেশনা এবং আধ্যাত্মিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সেক্যুলারিজম ও মানবকেন্দ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক সংকট সৃষ্টি করে।

- ইসলামে নৈতিকতা সর্বজনীন ও অবিচলিত, যেখানে পাশ্চাত্যে নৈতিকতার মান পরিবর্তনশীল এবং সমাজের মতামতের ওপর নির্ভরশীল।

২. ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলামী সভ্যতায় ধর্ম মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে তার প্রভাব নেই বললেই চলে।

- ইসলামে ধর্মীয় মূল্যবোধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

৩. পরিবার ও সামাজিক কাঠামো

ইসলামী সভ্যতায় পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি। এটি বিবাহ এবং পারিবারিক বন্ধনকে পবিত্রতা প্রদান করে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় পরিবার কাঠামো দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। বিচ্ছেদ, একক পিতামাতা, এবং সমলিঙ্গ বিবাহের মতো বিষয়গুলো সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে।

- ইসলামী সভ্যতায় নারীদের অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করা হয়েছে, যা পাশ্চাত্যের স্বাধীনতার নামে নারীদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের চেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ।

৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতি সুদমুক্ত, যা সামাজিক বৈষম্য এবং ঋণজালের সমস্যা সমাধান করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পুঁজিবাদ মুনাফাকেন্দ্রিক, যা ধনী-গরিবের বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে।

- ইসলামী সভ্যতা দান, জাকাত, এবং ইনসাফের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে।

৫. শাসনব্যবস্থা ও ন্যায়বিচার

ইসলামী সভ্যতায় শাসন শরীয়াহর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যা ন্যায়বিচার এবং সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় আইন মানবসৃষ্ট এবং পরিবর্তনশীল, যা অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে।

- ইসলামী শাসনব্যবস্থা শাসক ও জনগণের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ইসলামী সভ্যতায় বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। ইসলামী স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চা বিকাশ লাভ করেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিজ্ঞান এবং ধর্ম প্রায়শই সংঘর্ষে লিপ্ত। এটি আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বকে উপেক্ষা করে।

- ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানচর্চা আধ্যাত্মিকতা এবং মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত।

৭. শান্তি ও নিরাপত্তা

ইসলামী সভ্যতায় পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রধান। এটি সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বাধীনতার নামে আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পায়, যা অনেক সময় সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সার্থ রক্ষার্থে তারা মানবতা বিরোধী সংঘাতে লিপ্ত হতে ভাববে না।

- ইসলামী সমাজে অপরাধ দমন এবং নৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

৮. আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের ভারসাম্য

ইসলামী সভ্যতা দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা দুনিয়াবি সাফল্যের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয় এবং আধ্যাত্মিকতা উপেক্ষা করে। তাদের সাধারণ মতবাদ “YOLO- You Only Live Once”

- ইসলামে আত্মার উন্নতি এবং মানব কল্যাণ একে অপরের পরিপূরক।

৯. মানবাধিকার ও ন্যায্যতা

ইসলামে মানবাধিকার আল্লাহ প্রদত্ত, যা সব যুগে অপরিবর্তনীয় এবং সার্বজনীন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানবাধিকার সংজ্ঞা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনশীল এবং ক্ষমতাসীনদের দ্বারা প্রভাবিত।

- ইসলামে সমাজের দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

১০. ঐতিহাসিক অবদান

ইসলামী সভ্যতা শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচীন জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে উন্নতি করেছে, যার অনেকটাই ইসলামী সভ্যতার কাছ থেকে নেওয়া।

- ইসলামী সভ্যতার অবদান ছিল মানবকল্যাণমুখী, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক ক্ষেত্রে শোষণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী।
- মুসলিম জাতির উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা কুর'আনেই বলা আছে।

"তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে, আর আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।”
(আলে ইমরান, ৩:১১০)

মতামতঃ

পাশ্চাত্যের অনুসরণ বা অনুকরণ সর্বাবস্থায় ক্ষতির সম্মুখীন করে। বাহ্যিকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত না হলেও আত্মিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

“আকবার ইলাহবাদী পাশ্চাত্য অনুকরণকে সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে সমালোচনা করেছেন যেন পাশ্চাত্যের অনুসরণ যুবকদের বিলাসিতা,দীনের মধ্যে শিথিলতা, চাকুরির উপর নির্ভরশীলতা, আকীদার দুর্বলতার প্রসার না ঘটায়।” [২২]

“মুহাম্মদ ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে বলেন, ইউরোপের সভ্যতা মন ও অন্তর্দৃষ্টির বিনাশের মূল, ফলে এই সমাজের প্রাণ পবিত্র রাখতে পারেনি। আত্মার পবিত্রতা না থাকলে পবিত্র মন উচ্চ চিন্তাধারা ও সূক্ষ্ম অনুভূতিও বিদ্যমান থাকে।” [২৩]

ইসলামী সভ্যতা আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, এবং সামগ্রিক মানবকল্যাণে যেভাবে দিকনির্দেশনা দিয়েছে, তা পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় অধিক স্থিতিশীল এবং সার্বজনীন। ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা মানুষকে পৃথিবীতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তির দিকে পরিচালিত করে।

পরিশেষে বলবো, সর্বাবস্থায় ইসলাম সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা। কোনোভাবেই ভুল সংস্কৃতির অনুকরণ করা যাবে না যা দুনিয়া আখিরাত সব বরবাদ করে দেয়। হাদিসে এসেছে,
"যে ব্যক্তি কোনো কওমকে অনুকরণ করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত"
মুসনাদে আহমাদ, ২/৫, আবু দাউদ ৪০৩১

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধারণ করে আমাদের নিজেদের অবস্থান কাফিরদের সাথে করবো না যা আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে।

References

১. Edward Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.*

২. হাসান আলী নদভী (رحمه الله), *মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব.*

৩. Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of*

World Order.
৪. Bernard Lewis, *The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror.*
৫. মোহাম্মদ আসাদ, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত.*
৬. Dr. Bilal Philips, *সভ্যতার সংকট*, পৃষ্ঠা ৩১।
৭. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান, *সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ*, পৃষ্ঠা ৯৩।
৮. Dr. Bilal Philips, *সভ্যতার সংকট*, পৃষ্ঠা ৩২।
৯. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান, *সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ*, পৃষ্ঠা ৭৮।
১০. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান, *সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ*, পৃষ্ঠা ৮৫।
১১. ইফতেখার সিফাত, *হিউম্যান বিয়িং.*
১২. ইফতেখার সিফাত, *হিউম্যান বিয়িং.*
১৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী (رحمه الله), *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব*, পৃষ্ঠা ৮৬।
১৪. ইফতেখার সিফাত, *হিউম্যান বিয়িং.*
১৫. Dr. Bilal Philips, *সভ্যতার সংকট*, পৃষ্ঠা ৩৬।
১৬. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান, *সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ.*
১৭. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান, *সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ.*
১৮. Dr. Bilal Philips, *সভ্যতার সংকট*, পৃষ্ঠা ৩৩।
১৯. মোহাম্মদ আসাদ, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত*, পৃষ্ঠা ৪৬।
২০. মোহাম্মদ আসাদ, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত*, পৃষ্ঠা ৪১।
২১. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান, *সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ.*
২২. হাসান আলী নদভী (رحمه الله), *মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব*, পৃষ্ঠা ৯৭।
২৩. মুহাম্মদ ইকবাল, *Zarb-e-Kalim*, পৃষ্ঠা ৬৫।